ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ নোবেলপ্রাইজ ও অন্যভাবনা

তপন কুমার রায়*

সারসংক্ষেপঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) গীতাঞ্জলি (song offerings-1910) নামক কাব্য গ্রন্থ রচনার জন্য ১৩ নভেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'নোবেল প্রাইজে ' ভূষিত হন । এ গ্রন্থটির জন্য বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে সমগ্র বিশ্ব সেদিন সম্মান জানিয়েছিল । গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করণ , বহুবার বিদেশ ভ্রমণ ও তারসাথে নোবেল প্রাইজের প্রাপ্তি যোগ নিয়ে কিছু ভুল ধারণা ও নিন্দা বাক্য ছিল , যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভীষণভাবে ব্যথিত করত । আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখার চেষ্টা করব সেই সব যুক্তহীন ভাবনা গুলো কত ত্রুটিপূর্ণ !

'নোবেল প্রাইজে' - এর বিষয়টি ভূঁইফোড় হয়ে স্বয়ম্ভু হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এসে হাজির হয়নি । প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়কিংবা ডাইনিং টেবিলে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু পৌঁছানোর আগে রান্না ঘরের ভেতরকার বহু প্রস্তুতির একটা ইতিহাস থাকে , এখানেও তাই হয়েছিল , সেটা সহজেই বুঝা যায় । কবি কি মনে করে গীতাঞ্জলির কবিতাগুলোর অনুবাদ ইংরেজিতে করে গেলেন ? তিনি মনেমনে একটা কিছু অবশ্যই ভেবেছিলেন ।

মনের মধ্যে কিছু আশা এবং উদ্দেশ্যের ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল এ অনুবাদ কর্মের পেছনে । নইলে অনুবাদ করা নিয়ে তার মনোভাবের পরিবর্তন হলো কেন ? এমন একটা সময় ছিল , যখন কোনো রচনার ভিন্ন ভাষারই রুপান্তর , তর্জমা বা অনুবাদ করার ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করতেন না। বলা যায় অনীহাই ছিল । 'চরিত্র পূজা' গ্রন্থে ' রামমোহন রায়' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

''জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয়না । কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা বিশেষ হইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপণ করিলেতাহার স্ফুর্তি থাকেনা , তাহার ফুল হয়না , ফল হয় না , সে ক্রমে মরিয়া যায় ।"[১]

পরবর্তীতে এ রবীন্দ্র সুভাষিত কি সার্থকভাবে ফলে গিয়েছিল ।'ভাষান্তরে রোপণ ' করা গাছেও কত স্ফুর্তি এল , তাতে ফুল ফুটলো , ফলও ফলল এবং 'ক্রমে সে মরিয়া ' তো যায়নি বরং দীর্ঘজীবী হয়ে থাকল । এ বিষয়ে গীতবিতানের একটি সঙ্গীতের কয়েকটি কলি মনে পড়ছে ।
'' সেই তো আমি চাই –
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনাতো নাই ।।

* সহকারি অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ, চালনা কলেজ, দাকোপ, খুলনা ।

ফলের তরে নয়তো খোঁজা , কে বইবে সে বিষম বোঝা–
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই ।।
এমনি করে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্যনূতন ব্যথা!
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি , আবার আমি দুহাত মেলি –
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই ।। "[২]
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও ' অসীম ব্যাকুলতা ' ছিল , নিরবধি যাচনা ছিল । এজন্য নিজ জীবনবৃক্ষে নিত্য নতুন নতুন ফল ফলাবার সাধনা করেগেছেন ।

তাই আমরা দেখি অনুবাদ বিষয়ক এ নিবৃত্তিই এক সময়ে প্রবৃত্তিতে পরিণত হল । এখানে নিশ্চয়ই গোপন কোনো মনস্তত্ব কবির মনে সক্রিয় ছিল এবং এটা একটা কাকতলীয় ব্যাপার নয় যে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদের মাধ্যমেই রোটেনস্টাইনের প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামের এক ভারতীয় লেখকের সাথে পরিচয় হয় । তখনও দুজনের সাহিত্য বিষয়ক সাক্ষাৎ হয়নি এবং পরবর্তীকালে বন্ধুত্বও হয়নি । বিলেতের পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করার ইচ্ছে নিয়ে জগদীশচন্দ্র বসু এবং অবলা বসুর সাহায্য নিয়ে ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের ' ছুটি ,' ' কাবুলি ওয়ালা ' , 'দান প্রতিদান' গল্প তিনটি অনুবাদ করেছিলেন । সলতে পাকানোর ইতিহাসটির সূত্রপাত বোধহয় তখনই হয়েছিল । সম্ভবত এটা ১৯০১ সালের ঘটনা । ঐ গল্পগুলোর ইংরেজি অনুবাদ জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কতিপয় ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধু পত্নীকে পড়ে শোনালে তারা সকলেই খুব তারিফ করেন । তখন জগদীশচন্দ্র কবিকে লেখেন
'' তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশী বন্ধুদের শুনাইয়া থাকি , তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেনা । "[৩]
প্রত্যুত্তরে অনুবাদ কর্মের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লেখেন –
'' আমার রচনা লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ সম্মুখে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ । কিন্তু তাহার বঙ্গভাষারুপ বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভা সমক্ষে অপমান হইবে না ? "[৪]

কিন্তু বিধাতার মনে অপমানেরে পরিবর্তে সম্মাননার ইচ্ছেই ছিল প্রবল॥ । মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১২ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত কাবুলিওয়ালা গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেই রবীন্দ্র প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রোটেনস্টাইনের নজর পড়ে রবি কবির ওপর। উভয়ের এ যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির আগের ঘটনা । তারও অনেক আগে ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটেছিল ডিসেম্বর ১৯১০ সালে । এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

'' সেই সময় ব্রিটিশ শিল্পাচার্য উইলিয়াম রোটেনস্টাইন ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন । প্রায়ই তিনি জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁহাদের চিত্রশালা দেখিতে আসেন । বাংলার নতুন শিল্প চেতনা অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া তখন সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । রোটেনস্টাইন তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জন্য আসেন ।তিনি রবীন্দ্রনাথকেএখানে প্রথম দেখেন । কবির সৌম্য মূর্তি দেখামাত্র তাহার প্রতি

অন্তরের এমন আকর্ষণ অনুভব করিলেন যে তিনি তাঁহার ছবি স্কেচ করিবার অনুমতি না চাহিয়া পারিলেন না। তখন তিনি জানিতেন না এবং তাঁহাকে কেহ বলিয়াও দেন নাই যে, রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি ও মনীষী।"[৫]

এ সময় রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। এরপরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষপুত্র নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেনের ভুমিকার কথা আসে। বিলেতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্ঘে রোটেনস্টাইনের বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল। প্রমথ লাল ব্রাম্ম সমাজের বাণী প্রচার কল্পে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর সেখানকার কাজকর্মের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন । লোক মারফৎ যে সব গ্রন্থ প্রমথলালের বিলাতের গ্রন্থাগারে পাঠানো হয় তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু গ্রন্থ ছিল । যেমন- শান্তি নিকেতন ১ সেট , ধর্ম , নৈবেদ্য । এভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিলিতি সমাজের সামনে ধীরে ধীরে মেলে ধরেছিলেন । প্রমথলাল একজন রবীন্দ্র ভক্ত ছিলেন । কথায় কথায় তাঁর সঙ্গে রোটেনস্টাইনের আলাপচারিতায় মাঝে মধ্যেই রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ওঠে । ইতোমধ্যে কাবুলিওয়ালার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে রোটেনস্টাইন এতটাই মুগ্ধ হন যে

'' তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানতে চান রবীন্দ্র নাথের আরোও অনুবাদ পাঠাইতে পারেন কি না। এ পত্রের উত্তরে অজিতকুমার চক্রবর্তীকৃত কতকগুলো কবিতার অনুবাদ রোটেনস্টাইনকে পাঠানো হইয়াছিল ।"[৬]

ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রোটেনস্টাইনের আকর্ষণ তীব্র হতে থাকে। এ সময় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লন্ডনে আসেন।

'' প্রমথলাল একদিন হ্যাম্পস্টীড হীদ -এ রোটেনস্টাইনের বাসায় ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া উপস্থিত হন । কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কথা ওঠে । রোটেনস্টাইন দুই বছর পূর্বে অবনীন্দ্র নাথের গৃহে যে মানুষটির প্রতিকৃতি আঁকিয়া ছিলেন , তিনি যে এতবড় কবি সাহিত্যিক তাহা জানিতে পারেন নাই । কেহ সেই সৌম্য মূর্তির এ পরিচয় দেন নাই । রোটেনস্টাইন প্রমথলাল ও ব্রজেন্দ্রনাথকে বলিলেন , রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা যেন এদেশে আসিবার জন্য পত্র দেন । ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখিলেন । বিলাতে তাঁহারই মনের মতো কয়েকটি হৃদয় তাঁহার অপেক্ষায় আছে - তিনি যেন বিলাতে আসেন ।"[৭]

ভাবনার অবকাশ থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে যশপ্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছিল এখান থেকেই । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছে রোটেনস্টাইনের বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর হাতে একখানি ছোট নোট বইতে স্বকৃত গীতাঞ্জলির অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিলেন যাতে লেখা ছিল রোটেনস্টাইনকে উৎসর্গীকৃত । রবীন্দ্রনাথ এবার লন্ডনে পৌঁছেছিলেন ১৬ জুন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ।

উদ্দেশ্য তো থাকতেই পারে কিন্তু সেটার মধ্যে অশোভনতা কোথায় ? সব কিছুরই প্রস্তুতির অনেক সোপান থাকে – যা দিযে ক্রমশ উপরে উঠতে হয় । এর তিনদিন পর একটি ঘরোয়া সাহিত্য সভার আ য়োজন হয় । অধ্যাপক পিয়ার্সন তখন লন্ডনে ছুটি যাপন করছিলেন । তিনি কলকাতার

এক মিশনারি কলেজের অধ্যাপক হবার সুবাদে ভালো বাংলা জানতেন । এ বিষয়ে সুকুমার রায় তার বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে লেখেন – '' পরশু দিন (১৯ জুন ১৯১২) MR. REARSON .....তাঁর বাড়িতে আমাকে Bengali Literature সম্মন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন । .....সেখানে গিয়ে দেখি Mr. & Mrs Arnold, Mr. & Mrs Rothen Stein,Dr. PC Roy প্রমুখ অনেকে , তাছাড়া কয়েকজন সাহেব মেম উপস্থিত । শুধু তাই নয় , ঘরেঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন । .....India Office Librery থেকে বইটি এনে Material জোগাড় করতে হয়েছিল । তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা ' সুদূর ,' ' পরশপাথর ', ' সন্ধ্যা' , ' কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ ' ইত্যাদি অনুবাদ করেছিলাম ।"[৮]

এভাবে রবীন্দ্র পারিজাতের গন্ধ যত চারিদিকে আমোদিত এবং আনন্দিত করতে লাগল , ততই কবির মনে উদ্ভিন্ন হচ্ছিল কিছ আশার স্বপ্ন । ইতোমধ্যে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের টাইপ করা কপি রোটেনস্টাইন কয়েকজন বিদগ্ধ জনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিনলেন – যাদের মধ্যে কবি ইয়েটস্ অন্যতম। স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ডের সাহিত্য সমাজ ও বিদগ্ধজনদের প্রতি কবিরও ঔৎসুক্য বাড়তে লাগল । ইতোমধ্যে Nation পত্রিকার মধাহ্ন ভোজনে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রোটেনস্টাইন ইংল্যান্ডের তৎকালীন কয়েকজন মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দিলেন । এইচ.জি. ওয়েলস -এর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য তাকে শিল্পী রোটেন স্টাইন এক ডিনারে আমন্ত্রন করলেন । পরিচয় করানোর ব্রত যাপনের মধ্য দিয়ে রোটেনস্টাইন যেন বন্ধুকৃত্য করতে লাগলেন এবং এভাবেই নোবেল জয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। খ্যাতনামা মনীষী ও শিল্পাচার্য রোটেনস্টাইন ইয়েটস ছাড়াও আরও দুটি কপি পাঠিয়েছিলেন অক্সফোর্ডের কবিতার অধ্যাপক এনড্রু সিসিল ব্রাডলে এবং স্টপফোর্ড অগাস্টাস ব্রচককে । এ ব্রচক সাহেব আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একটা বড় দামীকথা বলেছিলেন –

'' তোমার এ কবিতাগুলোতে কোনো ধর্মের , কোনো Creed - এর গন্ধ নেই । ইহাতে এগুলো আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি ।"[৯]

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের এ সর্বজন গ্রাহ্যতা তথা বিশ্বজনীনতাই ছিল নোবেল প্রাইজের সিন্ধুক খোলার চাবিকাঠি। নিন্দুকেরা সেখানে বিন্দু মাত্র দাঁত বসাতে পারেনি ।

১৯১২ সালের ২৭ জুন বৃহস্পতিবার রোটেনস্টা্ইন এর হ্যাম্পস্টীড হীথ -এর বাসভবনে এক সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হয় । সেখানেই দুই কবি ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথের চারচক্ষুর মিলন পরিচয় হয় । এ সভায় ইয়েটস নিজে তার মুগ্ধতা বোধ নিয়ে রবীন্দ্রকৃত কয়েকটি কবিতার তর্জমা পাঠ করেন । একারণে প্রতিবছর ৩০জুন তারিখে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র কাব্যপাঠদিবস উদ্যাপন করা হয় ।

এখানে একটু বলার প্রয়েজন রয়েছে যে, কবি কেন নিজের করা অনুবাদকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন ?

মনে হয় এখানে নিজের মনের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়েই আগের মত বদল করে নিজেই অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কারণ এ অনুবাদের কাজ পরবর্তীতে তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল নবসৃষিট লীলা বা নবজন্মদানের মত। অজিত চক্রবর্তীকে এক পত্রে লিখেছিলেন–

''আমার কবিতাগুলোতর্জমা করতেই আমার সবচেয়ে ভাললাগে ,একেবারে নেশার মত চেপে ধরে যেসব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আরএক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুবএকটা রসপাওয়া যায়। .....আমি কবিতার ভিতরের জিনিসটাকে ইংরেজিতে লিখবার চেষ্টাকরি । ইংরেজ শ্রোতারা যখন এত জোরের সঙ্গে মাথানেড়ে বলে এটা তর্জমা নয়, তখন কথাটা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারিনে । ..... ইংরেজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে সেইটিকে অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারলে তবেই এ লেখাগুলোর সার্থক হতে পারবে । সেইদিকে লক্ষ্য রেখে লিখি বলেই এ রচনায় নূতন আনন্দ পাই ।''[১০]

এখানে 'ইংরেজ শ্রোতারা ' শব্দদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ইংরেজ শ্রোতাদের কথা ভেবে এবং নোবেল প্রাইজের প্রতি ভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ কর্ম করেছিলেন , এটা অনুমান করা যায় । কবি খুব সচেতন ছিলেন এবং ভয়ও পেতেন দুর্জনদের বাক্যবাণকে । মনোবাসনা তাই বোধহয় সরাসরি জানাতে ভয় পেতেন ।

''কিন্তু যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক দিয়ে কত ছোট কথাই শুনতে হবে , কত বিরোধ বিদ্বেষ , কত নিন্দা গ্লানি ,তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক । যতদিন পারি এ সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি ।''[১১]

লন্ডন থেকে ১৯১৩ সালের মে মাসে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এ চিঠিতে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তির প্রস্তুতি-যজ্ঞ যখন চলছিল , তখনও পাননি ,আদৌ পাবেন কিনা তাও জানা ছিলনা কবির। তখনই রবীন্দ্রনাথের মনে এ ধরনের দুশ্চিন্তা সক্রিয় ছিল এবং সেটা চেপে রাখতে পারেন নি । প্রকারান্তরে বেরিয়ে পড়েছে ।

[রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে এ সুসংবাদটি স্টকহোম ,সুইডেন থেকে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে ঘোষিত হয় । রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তি নিকেতনে । ১৩২০ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার ২৭ কার্তিক ।]

কিন্তু কত ভদ্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । কবি ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন সেই সব 'ছোট কথা ' শুনে । কত বিরোধ বিদ্বেষ , কত নিন্দা গ্লানি শুনে । ' কাকলী ' বলেছেন বায়স কুলের কর্কশ কা-কা রবকে দুর্জনেরা বলেছে , নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তদ্বির তদারক করতে হয়েছে । এর জন্য অনেক ভোজ সভার ব্যবস্থা করে সেখানে খানা পিনার সাথে কবিতা পাঠের আসর বসাতে হয়েছে কবিকে । একথা তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে বিলেতে গিয়ে সেখানকার বিদগ্ধ কবি সাহিত্যিক শিল্পী বন্ধুদের কাছে নিজের অসামান্য কবি প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার প্রচ্ছন্ন একটা মনো বাসনা কবির মনে লুকিয়ে ছিল এবং তিনি তা করেও ছিলেন । কিন্তু এর মধ্যে খারাপ গন্ধ কোথায় ? এত সব ব্যবস্থাপনা কেউ

না কেউ না করলে বিশ্বজন কি মোহিত হতে পারতো ? সন্ধান পেতো কি জোড়াসাঁকো তথা শান্তি নিকেতনে বসে থাকা এ কবি সর্বভৌমকে ? নড়েচড়ে বসে খ্যাতির জন্য নিজেকে মেলে না ধরলে তো খ্যাতি আসেনা । কবি নিজের স্বীকৃতিতেই দেখা যাক, তিনি এ বিষয়ে কি বলেছেন –

'' অন্যান্য সেবকদের মতো সাহিত্য সেবক কবিদেরও খোরাকি ও বেতন এ দুই রকমের প্রাপ্য আছে । তাঁরা প্রতি দিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু কিছু যশের খোরাকি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন , নিতান্তই উপবাসে দিন চলেনা ।''[১২]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সেবক যিনি যশের ভোজে খোরাকি যথেষ্ট পেয়েছেন ,আজও পাচ্ছেন এবং চিরদিন পাবেন । আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য সেবকরা হল আমাদের মতো চুনোপুটিরা । আমরা মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাহিত্য সভায় গিয়ে কবিতা পাঠ করি এবং মহা সমুদ্রে গিয়ে বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাই কিংবা – '' কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপন খোরাকি বন্দোবস্ত – তাঁহরা নিজে আনন্দ হইতে নিজের খোরাক যোগাইয়া থাকেন , গৃহস্থ তাঁহাদিগকে এক মুঠো মুড়ি – মুড়কিও দেয়না ।''[১৩]

এ ধরনের কবিরা গীতার আদর্শ ধর্মী , আত্মপ্রচার বিমুখ , নিরলস কর্মী, নির্লিপ্ত , উদাসীন , নির্লোভ নিষ্কাম । কর্মেই তাঁদের আনন্দ অধিকার , ফলে নয়। কবি এ সব কথা তাঁর আত্ম পরিচয় গ্রন্থে লিখেছিলেন বাংলা ১৩১৮ সালে । তার দুবছর বাদেই তিনি নোবেল প্রাইজ পান । অনেক কিছু ভেবেই তিনি কথাগুলো লিখেছিলেন ।

রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ ইয়েটসই গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন ১৯১২ সালের ২৭ জুন রোটেনস্টাইনের বাসভবনের সান্ধ্যভোজসভায় । এ যশের ভোজসভার আয়োজন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ করেননি । করেছিলেন স্বয়ং রোটেনস্টাইন । পাঠের আগে ভুমিকাকরে আর্নেস্টরীজ , এলিথ মেনেল, এজরাপাউন্ড , ইভালীন আন্ডারহীল , হেনরী নেভিনসন , মেসিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভিলিয়ান , সিএফ এনরুজ প্রমুখের সাথে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে রবীন্দ্রনাথের খুব প্রশংসা করেছিলেন । প্রাচ্য দেশীয় উপনিষদের ভাবরস সিক্ত এমন আধ্যাত্মিক গীতিকাব্য পাশ্চাত্যদেশের মানুষেরা এর আগে কখনো শোনেননি । কবি ইয়েটস-এর মুখে একের পর এক সেই কাব্যপাঠ শুনে শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত, নির্বাক এবং আপ্লুত অবস্থায় বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে সভা শেষে যে যার মতন বাড়ি চলে যান । বিলেতে এ ধরনের অসৌজন্যমূলক অভাবনীয় আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রথমটায় ভেবেছিলেন তাঁর কবিতাগুচ্ছ কারোর ভালো লাগেনি । বিদেশে কবিখ্যাতি প্রার্থী রবীন্দ্রনাথের সেই ভুল ভেঙেছিল পরে সকলের কাছথেকে মৌখিক প্রশংসা পেয়ে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি দেখে । তারপরে বিভিন্ন কবিতা পাঠের আসর এবং ভোজ সভায় কবিকে নিমন্ত্রণ – এর পর্ব চলতে লাগল ।

কবির বারবার বিদেশ ভ্রমণ নিয়েও নিন্দুকেরা সন্দেহ প্রকাশ করে কুৎসা রটনা করেছে । গোদা বাংলায় বলতে চেয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিদেশে গিয়ে নোবেল প্রাইজ পাবার ব্যবস্থাটা বেশ ম্যানেজ করে এসেছিলেন । এ সব কথা কানা ঘুষোয় কবির কানে অবশ্যই আসতো এবং

তা নিয়ে কবির দুঃখ বোধও কম ছিলনা । তবে তেমন করে অপলাপের প্রতিবাদ কোনোদিন করেননি ।

১৯১২ সালের ২৪ মে কবি যখন পুনরায় বিদেশ গমন করলেন – বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে জাহাজ ছাড়ল ২৭ মে । সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'যাত্রার পূর্বপত্র' নামে একটা লেখা লেখেন । পরে ' পথের সঞ্চয় ' গ্রন্থে সেটা সন্নিবেশিত হয়েছে । সেইখানে কবি খানিকটা কৈফিয়তের মত করে লিখেছিলেন –

'' আমাকে অনেকেই পশ্ন করেন , তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছনা কেন ? একথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাইনা । .....প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব । ''[১৪]

প্রয়োজন শব্দটি এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন । বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র বেড়ানোর জন্য কখনোই তিনি বিদেশ যাননি । উদ্দেশ্য সাধক প্রয়োজন মিটাতেই গিয়েছিলেন । তারপর আরএক জায়গায় কবি লিখেছেন –

'' অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়েছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা ভালো কৈফিয়ৎ – কিন্তু বাহান্ন বছর বয়সে সে কৈফিয়ৎ খাটেনা । এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে । ..... তবু একথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে । কেবল সুখ নহে এ ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজন সাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে । ''[১৫]

এখানে কবি নিজেই অনেক কথা স্বীকার করে অনেক আভাস দিয়ে গেছেন প্রয়েজন সাধন এবং লাভের প্রতি লোভের কারণে শুধু পারমার্থিক কারণে নয় আর্থিক কারণেও কবিকে বারবার বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে । কবির এ সঙ্গোপন ইচ্ছে । উদ্দেশ্য ও ভাবনার প্রতি আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল । নিন্দুকেরা বিশ্বপথিক এ বিশ্বকবিকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভাবল কেন ? অথচ এসব মানুষের দুর্ভাবনাগুলো কবিকে মাঝে মাঝেই ব্যথা – পীড়া দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি কি এমন দাসখত লিখেদিয়ে বসে আছে যে তাঁর কিছুই চাইতে নেই ? অথচ তিনিতো বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি পাওয়া সর্বত্যাগী উদাসীন মানুষ ছিলেন না । তিনি গৃহী , সন্তান বৎসল সংসারী তো বটেই , সেই সাথে নানা রকম সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়া এক মনীষী । তবু চাওয়া পাওয়া, পাওয়া-নাপাওয়া , তৃপ্তি অতৃপ্তির দ্বন্দ্ব ও দোলাচলের পরিচয় পাওয়া যায় । সব কিছুতেই কবির দুর্নিবার আকর্ষণ ও মনোযোগ ছিল । এ নিরীহ লোভের পাশাপাশি চারদিক সামলানো অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের গৃহিনীপনা ছিল বলেই তিনি বিশ্বনন্দিত হতে পেরেছিলেন । তারই ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্তির সুর বেরিয়ে আসত সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে । তখনও নিজেকে কোনো আপন জনের কাছে মেলে ধরে দেন । অজিত চক্রবর্তীকে লিখেছেন –

'' চারিদিকে আমার নিজের নামের এ ঢেউ তোলা এ আমার কিছুতেই ভালো লাগছেনা । এ নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে । ..... আমার মনের ভিতর কেবলই বলছে

এ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কোনো উপায়ে কোথাও পালাতে হবে । অথচ বাইরের দিক থেকে যে মোহ কেটে গেছে তা নয় । – দরজার কাছে যে পেটমোটা লোভী বসে আছে পথিকদের কাছথেকে হাতপাততে অভ্যাস সে এখনো ছাড়তে পারেনি ; এমনি করে এ দ্বারীটা তার অন্তর নিকেতনের ধনীকে নিজের লব্ধ দারিদ্র্যের দ্বারা প্রত্যহ অপমানিত করছে – এ লোকটাকে বরখাস্ত করতে নাপারলে তো উপায় দেখিনে ।''[১৬]

কবির এ ক্লান্ত বিষণ্নতার সঙ্গে সামিল হয়েও এখানে বলতে ইচ্ছে করে – যশের ভোজের আয়োজন যদি বার বার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ করেই থাকেনতো বেশ ভাল কাজই করেছেন । সেই আয়োজনের রন্ধন কর্ম যে রান্নাঘরে হয়েছিল তার সবকিছু দৃশ্যত লভ্যনা হলেও খাবার টেবিলে সেই যশের ভোজে আমরা বিশ্বজনেরাও সামিল হলাম। অর্থাৎ সেই যশের খোরাকি বিশ্বকবি তাঁদের সাথে আমাদেরকেও দিয়ে গেলেন । সেই নান্দনিক ভোজ আজও আমরা সানন্দে উপভোগ করছি । বরং এতসব সংগঠিত আকারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত রবীন্দ্রনাথ যদি না করতেন তবে কবি নিজেই যে কেবল বঞ্চিত হতেন তা নয় , তাঁর সঙ্গে আমরা বিশ্ববাসীও বঞ্চিত থাকতাম । পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসেও কি একটা বিরাট অধ্যায় অনুপস্থিত থাকতোনা ? কেবল বঙ্গদেশে প্রথম নয় , গোটা এশিয়া মহাদেশেও প্রথম নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি আমাদের পরম আনন্দ ও শ্লাঘার পরিচায়ক ।

তথ্যনির্দেশিকা

[১] বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ ,রবীন্দ্র সুভাষিত ,পৃ–১০

[২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,গীত বিতান , পূজা / ১৯১

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,চিঠিপত্র

[৪] *তদেব*

[৫] প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় , রবীন্দ্র জীবনী– ২য় খণ্ড , পৃ – ৩১০

[৬] *তদেব* , পৃ – ৩৮৮

[৭] *তদেব*

[৮] *তদেব*

[৯] *তদেব*

[১০] দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭, পত্রসংখ্যা– ১১

[১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র

[১২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, পৃ – ১৮১

[১৩] *তদেব*

[১৪] রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, পথের সঞ্চয়

[১৫] রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ দশম খণ্ড

[১৬] প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ– ৪১৯-২০